# কিশোর রচনা সমগ্র

# কিশোর রচনা সমগ্র

সম্পাদনা

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

পুনশ্চ

KISHORE RACHANA SAMAGRA MANIK BANDYOPADHYAY
*A collection of Writings for the young adults*
Edited by Dr. Parthajit Gangopadhyay

First Punascha Edition
January, 2026

ISBN 978-81-7332-764-3

Price ৲ 345

প্রথম পুনশ্চ সংস্করণ
জানুয়ারি, ২০২৬

প্রচ্ছদ আর্ট ক্রিয়েশন
অলংকরণ যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

দাম ৲ ৩৪৫

পুনশ্চ, ১১৪ এন, ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১০ থেকে
সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং শিবানী প্রিন্টিং ১৭এ, স্যার গুরুদাস রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত ফোন - ৮৯১০২৮৩৪৪৮
Email: punaschabooks@gmail.com
Web: www.punaschabooks.com

# পুনশ্চ সংস্করণ প্রসঙ্গে

মূলত যাঁরা বড়োদের লেখক, তাঁরা অনেকেই ছোটোদের জন্য লিখেছেন। আবার ছোটোদের জন্য একেবারেই লেখেননি, এমন লেখকও বিরল নয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় অশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'গল্পগুচ্ছ' পত্রিকায়। আশ্বিন ১৩৩৫-এ প্রকাশিত সে গল্পটির নাম 'ম্যাজিক'। 'ম্যাজিক' প্রকাশের তিন মাস পরে প্রকাশিত হয় 'অতসী মামী', 'বিচিত্রা'-র পৌষ ১৩৩৫ সংখ্যায়। মানিকের অনেক গল্পই প্রকাশিত হয়েছে 'বিচিত্রা', 'প্রবাসী' বা 'বঙ্গশ্রী'র মতো নামি পত্রিকায়। অল্প খ্যাত, এমনকি অখ্যাত সাময়িকপত্রেও তিনি অজস্র লিখেছেন। 'পুতুলনাচের ইতিকথা', 'ভারতবর্ষ'-এ প্রকাশিত হলেও 'পদ্মানদীর মাঝি' প্রকাশিত হয় সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'পূর্বাশা'-য়। দীনেশরঞ্জন দাশের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'কল্লোল' সে সময় কী বিপুল আলোড়ন তুলেছিল, তা আমাদের অজানা নয়। কল্লোলের কালেই মানিকের আবির্ভাব। পত্রিকা-পৃষ্ঠায় মানিকের আবির্ভাবের পর 'কল্লোল' বছর খানেকেরও বেশি মাসে মাসে বেরিয়েছে। মানিক সচেতনভাবেই 'কল্লোল'-এর কোলাহল এড়িয়ে চলেছেন। কল্লোলীয় সাহিত্যের সঙ্গে দ্বিতীয় পর্বের মানিককে তো নয়ই, প্রথম পর্বের মানিককেও মেলানো যায় না। 'কল্লোল'-এর লেখকদের সঙ্গে মানিকের অন্তত একটি সাদৃশ্য আমাদের নজর এড়িয়ে যায় না। 'কল্লোল'-এর প্রধান প্রধান কুশীলবদের হাতে আমরা ছোটোদের সাহিত্য পেয়েছি। বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় বা প্রেমেন্দ্র মিত্র অধিকাংশ ক্ষমতাবান কল্লোলীয় লেখকেরা ছোটোদের জন্য সময় দিয়েছেন। মানিক মুখ্যত বড়োদের লেখক হয়েও ছোটোদের জন্য ভেবেছেন। ভেবেছেন বললে কম বলা হয়, নিবিড়ভাবে ভেবেছেন। আদর্শ কিশোর-সাহিত্যের মডেল তো মানিকের হাতেই তৈরি হয়েছে।

'কল্লোল'-এর ফেনিলতায় হারিয়ে না গিয়ে ছোটোদের জন্যও কলম তুলে নিয়েছিলেন বুদ্ধদেব-অচিন্ত্য-শৈলজানন্দ-প্রেমেন্দ্র মিত্ররা। রীতিমতো ভালো লিখেছেন তাঁরা। 'রংমশাল' পত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত বুদ্ধদেবের কিশোর-উপন্যাস 'অন্য কোনখানে' বা অচিন্ত্যর 'ডাকাতের হাতে' সহজেই ছোটোদের অভিভূত করে। উন্মোচিত হয় ভিন্নতর জগৎ। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদার গল্প তো কিশোরমহলে প্রভূত জনপ্রিয়।

বড়োদের লেখক হিসেবে যাঁরা খ্যাত, তাঁদের দিয়ে ছোটোদের লেখা লেখানোর ব্যাপারে 'মৌচাক' (১৯২০) পত্রের সম্পাদক সুধীরচন্দ্র সরকারের অবদান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'মৌচাক'-এ বুদ্ধদেব ও শৈলজানন্দ অজস্র লিখেছেন। অচিন্ত্য ও প্রেমেন্দ্রও লিখেছেন কিছু। 'একটি পত্রিকা' শিরোনামাঙ্কিত প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসু তো স্পষ্ট করেই বলেছেন বড়োদের লেখকদের দিয়ে ছোটোদের লেখা লেখানোর ক্ষেত্রে সুধীরচন্দ্রের অত্যুজ্জ্বল ভূমিকার কথা।

একটু উদ্ধৃতি, দিই, 'মৌচাকের সম্পাদকমশাই উসকে না দিলে ছোটোদের লেখায় হয়তো আমি কখনোই হাত দিতুম না। আমার সমসাময়িক অনেক লেখকের সম্বন্ধেই এই কথা সত্য।'

কল্লোলের কোলাহল থেকে মানিক সচেতনভাবে দূরত্ব তৈরি করলেও কল্লোলীয় কারও কারও মতো 'মৌচাক' পত্রেই তাঁর কিশোরসাহিত্য চর্চার সূত্রপাত ঘটেছে। 'মৌচাক'-এর শারদীয় ১৩৪৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম ছোটোদের লেখা 'চণ্ডীচরণের গান'। মানিক 'মৌচাক'-এ খুব কম লেখেননি। বুদ্ধদেব বসুর মতো 'মৌচাক' সম্পর্কিত কোনো স্মৃতিকথা লিখলে মানিকও সম্ভবত বুদ্ধদেবের সুরেই সম্পাদক সুধীরচন্দ্রের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন। বুদ্ধদেব তাঁর সমসাময়িক লেখকদের সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তা মানিকের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। ছোটোদের জন্য লেখা মানিকের মৌলিক গল্পের সংখ্যা সব মিলিয়ে সাতাশ। এর বাইরে একটি অনুবাদ-গল্পও আছে। রয়েছে চারটি স্মৃতিমিশ্রিত গল্পধর্মী রচনাও। সাতাশটি মৌলিক-গল্পের মধ্যে বারোটি প্রকাশিত হয় 'মৌচাক'-এ। গল্পধর্মী স্মৃতিমিশ্রিত একটি রচনাও ওই পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছোটোদের কথা ভেবে চারটি উপন্যাস লিখতে শুরু করেছিলেন। 'মাটির কাছের কিশোর কবি' ও 'মশাল' যথাক্রমে 'আগামী' ও 'রংমশাল'-এ ধারাবাহিকভাবে ছাপা হত। তা সত্ত্বেও মানিক আকস্মিক উপন্যাস দু'টি থামিয়ে দেন। মাঝপথে পত্রিকায় কিস্তি দেওয়া বন্ধ করে দেওয়ার ফলে আমাদের কিশোর-সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মানিকের আরও একটি অসমাপ্ত উপন্যাস, 'রাজীবের লম্বা ছুটি' প্রথম মুদ্রিত হয়েছে রচনাসমগ্রের একাদশ খণ্ডে। মানিক ছোটোদের জন্য লেখা একটি উপন্যাসই শেষ করেছেন, সেটি 'মাঝির ছেলে', ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয় 'মৌচাক'-এ। শ্রাবণ ১৩৪৯ সংখ্যা থেকে ১৬ কিস্তিতে প্রকাশিত, সমাপ্ত হয় অগ্রহায়ণ ১৩৫০ সংখ্যায়। কার্তিক ১৩৫০ সংখ্যায় 'মাঝির ছেলে'র কোনো কিস্তি ছাপা হয়নি।

'মাঝির ছেলে' মানিকের খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস। একথা তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকর্মের দিকে তাকিয়ে নির্দ্বিধায় বলা যায়। আমাদের দেশে ছোটোদের লেখকরা প্রায়শই উপেক্ষিত রয়ে যান। অনেক স্মরণীয় সৃষ্টিও সেভাবে আলোচিত, আলোচনার মধ্য দিয়ে আলোকিত হয় না। ছোটোদের লেখা বলেই 'মাঝির ছেলে'ও একটু আড়ালেই রয়ে গেছে। আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কিশোর রচনাসমগ্র'-এ প্রথম ছোটোদের প্রায় সব লেখা একত্রিত করতে সক্ষম হয়েছিলাম। দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে জীর্ণ পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠায় মুখ গুঁজে পড়ে থাকা বিস্মৃতির অতলে হারাতে বসা কত লেখাই না উদ্ধার করেছিলাম! উদ্ধারপর্বটি ঘটনাবহুল ও আনন্দময়। কিছুকাল আগেও মানিকের অধিকাংশ কিশোর-রচনাই ছিল দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য। লেখকের ছোটোদের কোনো বই-ই— জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়নি। সাকুল্যে দু'টি বই, বহু রচনাই ধুলো-মলিন পত্রিকা-পৃষ্ঠায় অবহেলায় পড়েছিল। তাই মানিকের কিশোর-সাহিত্য নিয়ে অনেকেরই স্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠেনি।

মানিকের উল্লিখিত দুটি বইয়ের একটি 'মাঝির ছেলে', অপরটি 'ছোটোদের শ্রেষ্ঠ গল্প'। 'মাঝির ছেলে' প্রকাশিত হয় মানিক-প্রয়াণের বছর তিনেক পরে, নভেম্বর ১৯৫৯, 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড' থেকে। 'ছোটোদের শ্রেষ্ঠ গল্প' মানিক-প্রয়াণের বছর দেড়েক পর প্রকাশ করে 'অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির', জুন ১৯৫৮-তে। মোট বারোটি গল্পের সংকলন। এ বইয়ের ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন লেখক-সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। এই দুটি বইও দীর্ঘকাল অমুদ্রিত ছিল, এর বাইরে মানিকের যে কিশোর-সাহিত্য, তা তো পাঠকের ধরাছোঁয়ার মধ্যেই ছিল না। এখন মানিকের সব কিশোর-রচনাই সহজলভ্য, একখণ্ডে একত্রিত হওয়ার ফলে কিশোর সাহিত্যে মানিকের স্বাতন্ত্র্য অনেক বেশি করে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। স্বকীয়তায় নিজস্বতায় উজ্জ্বল তিনি। প্রবলভাবে সমাজসচেতন, মাটি ও মানুষের কাছে দায়বদ্ধ।

'ছেলেমানুষির ন্যাকামি করাকে ছেলেদের সাহিত্য' মনে করেন অনেকে। সেকালেও এমন মনে করা হত, এখনও হয়। এই মানসিকতার বিরুদ্ধে প্রথম জেহাদ ঘোষণা করেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ তখন চব্বিশ বছরের যুবক, ১৮৮৫ সালে ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত হয় ছোটোদের মাসিকপত্র 'বালক', জ্ঞানদানন্দিনী

দেবীর সম্পাদনায়। 'বালক'-এর কার্যাধ্যক্ষ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। 'বালক'-এর জন্য রচনা-নির্বাচনকালে রবীন্দ্রনাথ কখনো ছোটোদের ছোটো ভাবেননি। ছোটোদের সাহিত্যে, জল-মেশানো নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি। 'বালক'-পর্যায় থেকে রবীন্দ্রনাথের যে ভাবনার শুরু, সেই ভাবনার দ্বারাই আজীবন চালিত হয়েছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছোটোদের কখনো ছোটো ভাবেননি। তাদের মনে সতত শুভবোধ জাগিয়ে তুলেছেন। চিনিয়েছেন ভালো-মন্দ, আলো-অন্ধকার। ছোটোদের সাহিত্য ও বড়োদের সাহিত্যের মধ্যে যে সীমান্ত-বাধা রয়েছে, যে বিভাজন-প্রথা প্রচলিত, তা মেনে নিতে পারেননি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিশোরমনে বিস্ময় ও অনুসন্ধিৎসা জাগাতে সক্ষম, সংঘাতময় জীবনের গল্প একত্রিত করে গ্রন্থ-প্রকাশের কথাও ভেবেছিলেন তিনি। সে পরিকল্পনা অবশ্য বাস্তবায়িত হয়নি। বই না বেরুলেও বইয়ের ভূমিকা লেখা হয়ে গিয়েছিল। লেখক-পরিবারসূত্রে সেই ভূমিকাটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। মানিকের 'কিশোর রচনা সম্ভারে' প্রথম তা গ্রন্থিত হয়। ভূমিকাটি মূল্যবান। কিশোর-সাহিত্য সম্পর্কে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধারণা ও উপলব্ধি স্পষ্ট হয়ে উঠছে। মানিক লিখেছেন, 'ছোটোদের জন্য ছোটোদের কাগজে এবং বড়োদের জন্য বড়োদের কাগজে লেখা গল্প একত্র করে একটি গল্পসংকলন প্রকাশ করা সত্যই দুঃসাহস।... বড়োদের জন্য লেখা এমন গল্প যদি বেছে নেওয়া যায়, যাতে কিশোরমনকে বিগড়ে দেবার মতো কিছুই নেই, বরং গল্প পড়ে বড়োদের জীবন-সংঘাতের কমবেশি পরিচয় পেয়ে কিশোরমন নাড়া খাবে, বিস্ময় ও অনুসন্ধিৎসা জাগবে, সেরকম গল্প কিশোরদের পড়তে দিলে দোষ কী?'

মানিক-পরিকল্পিত এই বইয়ের জন্য 'আগামী' ও 'মৌচাক'-এর মতো বালক-পাঠ্য পত্রিকা থেকে যেমন গল্প বেছে নিয়েছিলেন, তেমনই গ্রহণ করেছিলেন সাবালক-পাঠ্য 'স্বাধীনতা', 'পরিচয়', 'মধ্যবিত্ত' ও অন্যান্য কয়েকটি মাসিকে প্রকাশিত গল্প।

জীবনভর ছোটোদের জীবন-সংঘাতের গল্পই শুনিয়েছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। চারটি উপন্যাস বিভিন্ন সময় লিখতে শুরু করলেও যে উপন্যাসটি তিনি সম্পূর্ণ করেছিলেন, সেই 'মাঝির ছেলে'তে এই ভাবনা যথেষ্ট জোরাল। জেলে-জীবন নিয়ে লেখা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্য উপন্যাসটি প্রভূত জনপ্রিয়। 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'পূর্বাশা'-পত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১ থেকে। বছর আটেক পর 'মাঝির ছেলে'-র প্রকাশ-সূচনা। পদ্মার বুকে যারা রুপোলি শস্য খুঁজে বেড়ায়, এই ভাবেই যাদের দিন গুজরান হয়, তাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে মানিকের অপরিসীম অভিজ্ঞতা ছিল। মাঝিমল্লাদের সঙ্গে দিনের পর দিন পদ্মার বুকে ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি। নিকট থেকে দেখা জেলে-জীবন, তাদের দুঃখের বারোমাস্যা সেই অভিজ্ঞতার আলোকে এই দুই উপন্যাসই আলোকিত। আলোহীন আশাহীন অন্ধকারময় সেই জীবন সম্পর্কে আমাদের সম্যক ধারণা হয়ে যায় সহজেই। প্রথম উপন্যাসটির অনুকরণ নয় দ্বিতীয় উপন্যাসটি। একটির সঙ্গে আরেকটির সংযোগ-সম্পর্ক গোপন থাকেনি। বলা যায়, 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটির পরিপূরক 'মাঝির ছেলে'। মানিকের অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য এই উপন্যাসটি সেভাবে আলোচিত হয় না।

'মাঝির ছেলে'-র নায়ক নাগা বয়সে তরুণ। সতেরো-আঠারো বছর বয়স। বয়সের তুলনায় তার শরীরের বাড়-বৃদ্ধি ঘটেছে বেশি। গোপন থাকেনি বলিষ্ঠতা। মানিক জানিয়েছেন, 'নাগার গায়ের জোর অনেক মাঝির চেয়ে বেশি'। যথেষ্ট স্বাস্থ্য-সচেতন সে। 'নাগা শুধু পেট ভরাতে চায়, মেটাতে চায় তার খিদের জ্বালা। হয়তো এই পেটুকপনার জন্যই অন্য মাঝিদের ছেলের চেয়ে নাগার শরীরটা অনেক বেশি লম্বা-চওড়া হতে পেরেছে, চেহারায় একটু লাবণ্য আছে।'

লাবণ্য আছে নাগার মনেও। দিনগত পাপক্ষয়, গড্ডলিকা-প্রবাহে জীবনপাত নয়, নতুনতর আশা-স্বপ্নে উজ্জীবিত হয়েছে। যথেষ্ট সে অনুভূতিপ্রবণ, সংবেদনশীল। তাঁর মনে হয়েছে আধখানা চাঁদের আলো দুঃখী মানুষের হাসির মতো ছড়িয়ে আছে। স্নেহের কাঙাল সে, প্রেমপ্রত্যাশী।

অন্য মাঝির ছেলেদের শরীর-গড়ার মানসিকতা নেই। 'হাড়ভাঙা খাটনি খাটতে খাটতে মাংসপেশিগুলি শুধু শক্ত হয়ে দড়ির মতো মুচড়ে যায়। স্বভাবের স্বাতন্ত্র্য, শরীরের বলিষ্ঠতা নাগার জীবনে পরিবর্তন বয়ে আনে। যাদববাবুর পছন্দ হয় তাকে।' মানিক উপন্যাসটির দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনায় জানিয়েছেন, 'নাগাকে

যাদববাবুর খুব পছন্দ হয়ে গেল। নাগার সুগঠিত জোরালো শরীর দেখে নিজের কুস্তির নেশার দিনগুলির কথা তাঁর মনে পড়তে লাগল।... জীবনে হয়তো একটা দিন ডন-বৈঠক না দিয়েও আপনা থেকেই নাগা তার চেয়ে বড়ো পালোয়ান হয়ে উঠেছে। মাঝির কাজও নাগা ভালোই জানে। আটখামার থেকে রামতলা পর্যন্ত তার ঘণ্টাচারেকের মাঝিগিরির মধ্যেই তার প্রমাণ মিলেছে।

বেঁচেবর্তে থাকার জন্য নাগার নিরন্তর লড়াই, সর্বক্ষণ অনিশ্চয়তা-অস্থিরতা, টালমাটাল দিনগুলির বুঝি শেষে অবসান হয়। খিদের ছটফটানি আর তাকে সহ্য করতে হবে না। 'সাড়াডাদিন খাওন ছাড়া তার কাম নাই'— এসব বলে মুখঝামটা দিয়ে হারুমাঝি প্রবল অবহেলায় একটা পয়সা ছুড়ে দেওয়ার আর সুযোগ পাবে না। যাদববাবুর আহ্বান নাগার জীবনে স্বস্তি আনে, অবসান হয় দুর্ভাবনার। নিজেকে সে আবিষ্কার করে। তার অনুভূতিপ্রবণ মনটি কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে, সতত অবহেলিত আর অপমানিত হতে হতে মরেহেজে নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। নব আনন্দে জেগে উঠেছে নাগা। যাদববাবুর বাড়ি এসে নাগার জগৎটাই যেন বদলে গেল। পেটের ভাবনা তো এখন আর তাকে ভাবতে হয় না। 'কী খাব, কী খাব' এই চিন্তার জেলখানায় সে যেন এতদিন কয়েদি হয়েছিল, এখন ছাড়া পেয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখবার সুযোগ পেয়েছে। মানুষ থেকে শুরু করে ঘরবাড়ি, মাঠ-ঘাট, নদী সব যেন খোলস ছেড়ে নতুন হয়ে উঠেছে তার কাছে। নতুন কিন্তু অচেনা নয়। একটু সহজ স্নেহ-মমতা, পেটভরা খাদ্য, আর পরিশ্রমের মর্যাদা তার ভিতরে যে পরিবর্তন এনেছে সেই পরিবর্তনই বাইরের জগৎকেও তার কাছে নতুন করে তুলেছে। নাগা বিকশিত-প্রস্ফুটিত হয়েছে। ভালোবাসায় জীবনপাত্র উছলিয়া পড়েছে। যাদববাবুর স্নেহ, রূপার প্রেম তার মন ভরিয়েছে। যাদববাবু কড়ে আঙুলের আংটি খুলে নাগার আঙুলে পরিয়ে দিয়েছেন। সেই আংটি নাগা পরিয়েছে রূপার আঙুলে। দু'চোখে সোনালি স্বপ্ন, রং লেগেছে মনে। বলেছে, 'তরে আমি বিয়া করুম, রূপা'।

নাগার মধ্যে পদ্মানদীর মাঝি-র কুবেরের আভাস আছে। যাদববাবুর মধ্যে হোসেন মিয়ার ছায়া। এই আভাস-ছায়া হয়তো তেমন স্পষ্ট নয়। আবছা-ঝাপসা হলেও অগ্রাহ্য করার মতো নয়। নদী সংলগ্ন জীবন, নদীর প্রতি সুতীব্র আকর্ষণ। এই আকর্ষণ অন্তর থেকেই উৎসারিত। তবু তার মনে জেগেছে সমুদ্র-পিপাসা। এই আকাঙ্ক্ষা আকস্মিক জাগেনি, মনের কোণে সংগোপনে ছিল, তা উপন্যাসের অন্তিমপর্যায়ে তীব্রতর হয়ে উঠেছে। লাইফ-বেল্ট তুচ্ছ হয়ে যায়। সমুদ্রের সঙ্গে মিশে গিয়ে শুরু হয় তার 'আসল সমুদ্র যাত্রা'।

উপন্যাসের এই পরিণতিতে নাগার প্রতি আমাদের কাতরতা বাড়ে। বেদনা-দীর্ণ হই আমরা। উপন্যাসের শুরুতেই লড়াকু নাগাকে ঘিরে আমাদের যে ভালোলাগা, মুগ্ধতার শুরু, তা ক্রমেই বিস্তৃত—প্রসারিত হয়েছে। তাকে সামনে রেখে দারিদ্র্যক্লিষ্ট দিনযাপনের ছবি এঁকেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। ধূসর জীবনের বিবর্ণ চিত্রমালা শুধু নয়, মূর্ত হয়ে উঠেছে জীবনের মাধুর্য্যও।

যাদববাবুর সঙ্গী হয়ে রোমাঞ্চকর চোরাচালানের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার ঘটনাটুকু ছাড়া নাগার মধ্যে অনৈতিক কিছু তো খুঁজে পাওয়া যায় না। চোরাচালানের এই অংশটি উপন্যাসে ভিন্নতর মেজাজ এনেছে, তৈরি হয়েছে অ্যাডভেঞ্চারের আবহ। মানিকের কলমে এই অ্যাডভেঞ্চারের ভিন্নতর মেজাজটি আমরা উপভোগ করি, কখনোই নাগার প্রতি ধিক্কার বর্ষিত হয় না। বরং সহানুভূতি জাগে। তার অসহায়তা আমাদের স্পর্শ করে। নাগা কী বা করবে! যাদববাবুরাই তো ক্ষমতার প্রতিভূ, চালিকাশক্তি। তথাকথিত যে 'নীচুতলার জগৎ' 'মাঝির ছেলে'-তে ফুটে উঠেছে, সেখানে প্রেম আছে, প্রীতি আছে, আছে করুণার আলোড়নও। বৃহত্তর সমাজজীবন থেকে হয়তো ক্রমক্ষীয়মান, কিন্তু নিঃস্ব-রিক্ত মানুষগুলির মধ্যে, লড়াকু নাগার মধ্যেও রয়েছে চিরন্তন মানবিক মূল্যবোধ। নাগার কত না গুণাবলি! তার সততা ও আত্মসম্মানবোধ আমাদের অভিভূত করে। রয়েছে প্রবল বিবেকবোধও। গরিব মাঝিদের মধ্যে চরণমাঝি আরও গরিব। চরণমাঝির কথা ভেবে নাগার সবুজ-কোমল মন কাতর হয়। 'গরিব মানুষের সরম কিরে, খাওয়ান জোটে না, সরম?' হারুমাঝির এসব কথা তার কাছে অর্থহীন-অমূলক ঠেকেছে। নাগা কখনো নতজানু হয়নি। শত প্রতিকূলতার মধ্যে উন্নত তার শির। টলানো যায় না তাকে। নীচুতলার যে জগৎ মানিকের মরমি লেখনীতে উন্মোচিত হয়েছে, সে জগৎ এযাবৎ আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরেই ছিল। আপাতভাবে হয়তো বা কিছু ভাসা-ভাসা ধারণা লালন

করেছি মনে। সেই ধারণা যে যথাযথ নয়, যথেষ্ট ফাঁক ও ফাঁকি রয়ে গেছে, প্রায় আদর্শায়িত হয়ে ওঠা নাগার দিকে তাকিয়ে, তাকে অনুভব করে, নিজেদের গলদ সহজেই আমরা টের পাই। নাগার সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

ছোটোদের সাহিত্যের উৎস খুঁজতে গেলে আমাদের লোকায়ত সাহিত্যের কাছে যেতে হবে। ঢের পুরোনো রূপকথা-লোককথা বা ছড়ায় সময়ের কথা, সমাজের কথা, মানুষের কথা তো ঘুরেফিরেই এসেছে। সুকুমার রায়ের মতো ছোটোদের সাহিত্যের মহৎ স্রষ্টারাও দেখিয়ে দিয়েছেন যে, জীবন থেকে পালিয়ে কোনো সাহিত্যই হয় না, ছোটোদের সাহিত্য তো নৈব নৈব চ। ছোটোদের জীবনবিমুখ করে তোলার অপচেষ্টা ক্রমবর্ধমান। ছোটোদের সাহিত্যের নামে প্রায়শই যা ছড়ানো হয়, তা আর যাই করুক, মানুষ হয়ে ওঠার কথা বলে না। চেনায় না এই সমাজ, আমাদের চারপাশ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছোটোদের লেখার ক্ষেত্রে কতখানি সমাজসচেতন ছিলেন, তা এই কিশোরপাঠ্য উপন্যাসটিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

শুধু 'মাঝির ছেলে'-তে নয়, অসমাপ্ত অন্য উপন্যাসগুলিতে, গল্পেও রয়েছে সমাজসচেতনতার সাক্ষ্য। দায়বদ্ধতায় উজ্জ্বল। কলম-পেষা মজুর, সাহিত্যই ছিল মানিকের জীবন-জীবিকা, বেঁচেবর্তে থাকার প্রধান অবলম্বন। অথচ কখনো শৌখিন মজদুরি করেননি, লেখেননি ক্ষতিকর কিছু, যেমন হামেশাই লেখা হয়।

নিয়ত দায়বদ্ধ থেকেছেন সময়, সমাজ ও জীবনের কাছে। অনিয়মিতভাবে সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় সাত কিস্তি লেখা অসমাপ্ত উপন্যাস 'মাটির কাছের কিশোর কবি'-র সূচনা-অংশে মানিক তো লিখেইছেন, 'যতই রং চড়াই আর কল্পনার রসে রসাই মাটির মানুষকে আর মাটির মানুষের জীবনকে অন্তত ভিত্তি হিসাবে অবলম্বন না করে আমি গল্প ফাঁদতেই পারি না, লিখব কী!' এই উপন্যাসটির ভিত্তি কি অকালপ্রয়াত কবি সুকান্তর জীবন? সুকান্ত-প্রয়াণের (১৩৫৪/২৯ বৈশাখ) প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর পর, ১৩৫৯-এর মাঝামাঝিতে 'মাটির কাছের কিশোর কবি' লিখতে শুরু করেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুজতুল্য সুকান্তর প্রতি মানিকের সুগভীর স্নেহ-ভালোবাসা ছিল। কিশোর কবির রচনা-বলিষ্ঠতায়, প্রত্যয়-দৃঢ়তায় মুগ্ধ হয়েছিলেন তিনি। লক্ষ করেছিলেন, 'খর্বদেহ, নিঃসহায়, তবু তার মুষ্টিবদ্ধ হাত উত্তোলিত, উদ্ভাসিত কী এক দুর্বোধ্য প্রতিজ্ঞায়।' সুকান্তর অসুস্থতা, ক্রমাবনতি মানিককে উদ্বিগ্ন করেছে। পথে নেমেছেন, সকলকে একত্রিত করেছেন। 'রক্তপায়ী কীট'দের চাঁদা তুলে মারার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন। 'রাত্রিজ মেঘের' সমস্ত 'ষড়যন্ত্র' বানচাল করতে নিরলস চেষ্টা করেছেন।

'মাটির কাছের কিশোর কবি' পড়তে গিয়ে পাঠকের যে সুকান্তর কথা মনে পড়বে, এবিষয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও নিশ্চিত ছিলেন। উপন্যাসের সূচনায়, মুখবন্ধে তিনি জানিয়েই দিয়েছেন, 'এটা আমাদের নতুন যুগের কবি সুকান্তের জীবনীও নয়, তার জীবনকাহিনী ভিত্তি করে লেখা উপন্যাসও নয়। এটা স্রেফ উপন্যাসচরিত্রই বলো আর কাহিনীই বলো সব আমার মগজের কারখানায় তৈরি।' এই কৈফিয়ত দেওয়ার পরই আবার জানিয়েছেন, 'সুকান্ত সম্ভব না হলে, মাটির কাছের আরও অনেক কিশোর কবি সম্ভব না হলে, তোমাদের জন্য আমার এই উপন্যাস লেখাও সম্ভব হত না।' সন্দেহ নেই যে, দারিদ্র্যক্লিষ্ট অভাবী কিশোরের মধ্যে সুকান্তর ছায়া পড়েছে। প্রবল দারিদ্র্যের সঙ্গে নিয়ত লড়াই করা লড়াকু কিশোর কাব্যপ্রাণ, কবিতা লেখে। তার কবিতাতেও জঞ্জালমুক্ত শিশুর বাসযোগ্য পৃথিবীর কথা এসে পড়ে। আবেগদীপ্ত কিশোর লেখে, 'চারিদিকে যত অত্যাচার/যত ব্যথা যত দুঃখ ভার/ জমিয়েছে জঞ্জাল সমান/ঘুচাইয়া দিব নব প্রাণ।'

সমস্যা-দীর্ণ জীবন, দারিদ্রের কশাঘাতে জেরবার হয়েও কিশোর ভেঙে পড়েনি। সতত তার মনে ক্রিয়া করেছে আশাবাদ। অসীম মনের জোর। এমন মনের জোর 'মাঝির ছেলে'র নাগার মধ্যেও দেখা যায়। মানিকের কিশোর-সাহিত্যের অন্য চরিত্রেও এমনই দেখা গেছে কখনো-বা। আসলে মানিক ছোটোদের বড়ো হওয়ার কথা শোনাতে চেয়েছিলেন। শুনিয়েছেনও। তাই তাঁর কিশোর-সাহিত্যে প্রেরণাদায়ী চরিত্রের

এত আনাগোনা। নাগার মতো এদেরও আদর্শায়িত করে এঁকেছেন। 'মাটির কাছের কিশোর কবি'তে যে অনুভূতিপ্রবণ, পরোপকারী ও হৃদয়বান কিশোরের কথা রয়েছে, সবাই যদি তেমন হত, তবে তো এই পৃথিবীটা সত্যিই সব পেয়েছির দেশ হয়ে যেত।

শুধু তো দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই নয়, চারপাশে কত বৈষম্য, অন্যায়-অবিচার। দরিদ্র মানুষ সতত শোষিত হয়, লাঞ্ছিতও। 'রংমশাল' পত্রে অনিয়মিতভাবে নয় কিস্তিতে লেখা অসমাপ্ত 'মশাল' উপন্যাসে মূর্ত হয়ে উঠেছে দারিদ্রের লাঞ্ছনা, ধনী মানুষের আসল রূপ। সত্যবতী ইনস্টিটিউশনের ছাত্র কৃষ্ণদাস চানাচুরওলার সন্তান বলেই পিতার অর্থগৌরবে গৌরবান্বিত সহপাঠী ছাত্রদের হাতে চরমভাবে লাঞ্ছিত হয়। গরিব মানুষ মুখবুজে বড়োলোকের বেয়াদপি সহ্য করবে, তা কী করে হয়! শুধু কৃষ্ণদাস নয়, তার বাবা দীননাথও চূড়ান্ত লাঞ্ছিত হয়, হয় শারীরিকভাবে নিঃগৃহীতও। সহপাঠী বেয়াদপ ছাত্রদের বেয়াদপির বিরুদ্ধে কৃষ্ণদাস ফুঁসে উঠেছে। তাদের শায়েস্তা করেছেন পাগলা ডাক্তার, যিনি 'ডাক্তার না হয়েও ডাক্তারি করেন, নিজের খেয়ালে।' কড়া মানুষ। একদা ওকালতি করতেন। 'একটা গোরুচোর নাকি পাগলা-ডাক্তারের ওকালতিতে ফাঁসি যেতে বসেছিল।' এহেন পাগলা-ডাক্তার যেভাবে অপরাধী সহপাঠীদের শায়েস্তা করেছে, আপাতভাবে তা হাস্যরসাত্মক হয়েও সুদূর-প্রসারিত অর্থবহ।

মানিকের ছোটোদের লেখায় প্রেরণাদায়ী চরিত্ররা এইভাবেই রয়ে যায়। উজ্জ্বল তাদের উপস্থিতি। অসমাপ্ত 'মশাল'-এর কৃষ্ণদাস সহজেই ছোটোদের অনুপ্রাণিত করবে। উদ্দীপ্ত করবে। সমাজটাকে মানিক চেনাতে চেয়েছিলেন। 'মশাল' পড়তে পড়তে ছোটোদের চেনা হয়ে যাবে ধনবানদের আসল রূপ। মুখোশের আড়ালে থাকা মুখ। শুধু চেনা বা বোঝা নয়, তাদের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার স্পর্ধাও অর্জন করবে তারা, এটা কম বড়ো কথা নয়। গুরুত্বপূর্ণ এই উপন্যাসটি শেষ হলে আমাদের কিশোর-সাহিত্য সমৃদ্ধই হত। 'মশাল'-এর ন কিস্তি 'রংমশাল'-এর পাতায় ছাপা হয়েছিল বড়োই অনিয়মিতভাবে। টানা ক-মাস বের হয়নি, এমনও ঘটেছে। মানিক এই অনিয়মের জবাবদিহি করেছিলেন, দিয়েছিলেন প্রতিশ্রুতিও। ভাদ্র ১৩৫২ সংখ্যায় 'রংমশাল' যারা পড়ে, তাদের উদ্দেশ্যে মানিক লিখেছিলেন, 'অসুখ, হাঙ্গামা, দাঁতের শত্রুতা এইসব অনেক কিছু আমায় সামগ্রিকভাবে কাবু করেছে। মশাল লিখে উঠতে পারছি না, এজন্য তোমাদের কাছে বিরাগহীন প্রশ্রয় কামনা করছি কিছুদিনের জন্য। সুস্থ হলেই মশাল লেখার চেষ্টা করব।'

না, 'মশাল' শেষ করেননি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। 'রংমশাল' আরও কিছুকাল বেরিয়েছে। মানিকও অন্য লেখা লিখেছেন। 'মশাল' আর পুনরায় প্রজ্জ্বলিত হয়নি। ক্ষতি হয়েছে, আমাদের— কিশোর সাহিত্যের। মানিকের 'রাজীবের লম্বা ছুটি' প্রসঙ্গেও এই কথা বলতে হয়। অসমাপ্ত এই উপন্যাসটি অবশ্য অন্য দুটি অসমাপ্ত উপন্যাসের মতো পত্রিকা-পৃষ্ঠায়-ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়নি। কিছু পৃষ্ঠা লেখার পর অজ্ঞাত কারণে মানিক আর লেখেননি। উপন্যাসটি শেষ হলে একবারে অন্যরকম একটি অ্যাডভেঞ্চার হাতে পেত কিশোর-পড়ুয়ারা। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের মতো আরও কেউ কেউ সমকালে যে ঘরানার অ্যাডভেঞ্চার লিখতে অভ্যস্ত ছিলেন, তার সঙ্গে মানিকের 'রাজীবের লম্বা ছুটি'কে মেলানো যায় না। প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিটির দু'এক স্থলের যোগসূত্র বিঘ্নিত হয়েছে, মাঝের পৃষ্ঠাগুলি নেই। তা সত্ত্বেও বোঝা যায়, রহস্য কী মুন্সিয়ানায় ঘনীভূত হয়েছে, মনোহরকে ঘিরে তৈরি হয় আমাদের অসীম কৌতূহল। নিরসন হয় না, সে কৌতূহল জাগ্রত রয়ে যায়। রাজীব, বাণী ও অনিল রহস্যভেদ করার জন্য এগিয়েছে বটে, পড়তে পড়তে আমরাও তাদের সঙ্গে সামিল হয়ে পড়ি। কিছুদূর এগিয়েই খেই হারিয়ে যায়। বুঝতে পারি না কোনপথে এগোতেন মানিক! জাল তো ছড়িয়েছিলেন, জাল গুটোতেন কীভাবে, তা আর জানা হয় না। এক-আধটা নয়, তিন-তিনটে উপন্যাস শেষ না-করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কিশোরপাঠকদের বঞ্চিতই করেছেন।

মানিকের ছোটোদের উপন্যাসে যে জীবনের উত্তাপ, সমাজমনস্কতা পরিলক্ষিত হয়, তা রয়েছে তাঁর গল্পেও। 'মৌচাক'-এর কথা তো আগেই বলা হয়েছে। এই পত্রিকায় তো অনেকগুলি গল্পই প্রকাশিত হয়। 'পাঠশালা', 'রংমশাল', 'আগামী' ও 'সাপ্তাহিক জাগরণ'-এও প্রকাশিত হয়েছে কয়েকটি। বেশ কয়েকটি প্রকাশিত হয় পূজাবার্ষিকীতে, অধিকাংশই দেবসাহিত্য কুটিরের, দু'একটি অন্য প্রকাশনা সংস্থার বার্ষিকীও আছে। বার্ষিকীগুলি সম্পাদনা করেছেন বিভিন্ন খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব। যেমন, বুদ্ধদেব বসু, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

নামি ছোটোদের পত্রিকায় নিরন্তর উপস্থিতি, সুখ্যাত লেখক-সম্পাদকরা সাদরে বার্ষিকীগুলিতে লেখা প্রকাশ করেছেন, তবু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশক-আনুকূল্য পাননি। প্রকাশকদের অদূরদর্শিতা, না লেখকের নির্লিপ্ততা, তা জানার কোনো সূত্র আমাদের সামনে নেই। মানিকের দিনলিপি থেকে জানা যায়, 'মাঝির ছেলে' ও ছোটোদের জন্য লেখা গল্পের একটি সংকলন প্রকাশ তরান্বিত করার জন্য প্রয়াসী হয়েছিলেন শিবরাম চক্রবর্তী। মৃত্যুর বছর দেড়েক আগে (দিনলিপিতে উল্লিখিত তারিখ ৬.৫.৫৫) এক 'যোগাযোগময় ঘটনা' ঘটলেও তা লেখকের জীবদ্দশায় কার্যকরী হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা জরুরি, শিবরাম যে প্রকাশকের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে 'মাঝির ছেলে' তাঁরাই ছেপেছিলেন। ছোটোদের গল্প-সংকলনটি অবশ্য প্রকাশ করেন অন্য প্রকাশন-সংস্থা। তাঁর 'ছোটোদের শ্রেষ্ঠ গল্প' বইটির ভূমিকায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কিশোর-পাঠকদের উদ্দেশ্যে লেখেন, 'লেখক হিসেবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে কত বড়ো ছিলেন, তোমরা বড়ো হয়ে তাঁর লেখা পড়ে তা বুঝতে পারবে। তিনি যা নিয়ে লিখতেন তা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে তাঁর আগে কেউ আর লেখেননি। তিনি যেমন করে লিখতেন, তেমনিভাবে আর কেউ তাঁর আগে লেখেননি, এখনও কেউ লেখেন না।'

এরপরই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'পদ্মানদীর মাঝি'র কথা বলেছেন। বোঝা যায়, এসব বড়োদের সাহিত্যের দিকে তাকিয়েই বলেছেন তিনি। আমরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিশোর-সাহিত্য সম্পর্কেও এই একই কথা বলতে চাই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগে ছোটোদের সাহিত্যে এভাবে সময় ও সমাজ প্রতিফলিত হয়নি। এভাবে নিরবচ্ছিন্নভাবে আসেনি দারিদ্র, মানুষের দুঃখের বারোমাস্যা, তাদের দুঃখ-দুর্দশার পাশাপাশি লড়াই-সংগ্রামের বিবরণও। অলীক কল্পনার জগতে নয়, মাটির পৃথিবীতে ছিল তাঁর অবস্থান। বাস্তবের গল্প শুনিয়েছেন তিনি।

দুর্ভিক্ষকবলিত বঙ্গদেশের মরমি চিত্রমালা সমসাময়িক অনেকের রচনাতেই এসেছে। মানিকের 'অসহযোগী' গল্পে রমেন যা করেছে, তা অতুলনীয়। শিক্ষণীয়ও বটে। মুনাফালিপ্সু পিতার আড়তের সমস্ত চাল বিলিয়ে দিয়েছে বুভুক্ষু মানুষজনের উদ্দেশে। রমেনের কর্মকাণ্ড নিশ্চয়ই কিশোর-প্রাণকে উদ্বুদ্ধ করবে। ছোটোদের লেখক সবুজমনে শুভবোধ জাগাবেন, এটাই তো তাঁর কাছে প্রত্যাশিত। তিনি ছোটোদের ভালোমন্দ চেনাবেন, আলো-অন্ধকার স্পষ্ট করে তুলবেন। ছোটোদের লেখক মানুষ গড়ার কারিগর। তাঁর দায়দায়িত্ব অনেক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে যে সজাগ-সচেতন ছিলেন, তা তাঁর গল্পগুলিতে বার বারই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিশোর-গল্প মানবিকতায় উজ্জ্বল। প্রসঙ্গত 'চোর সাধুচরণ' গল্পটির কথা বলা যেতে পারে। চোর সাধুচরণ ধরিয়ে দিয়েছে তার থেকে ঢের বড়ো দুই চোরকে। যারা ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক সরকারি কুইনিন, যা রিলিফের জন্য বিনি পয়সায় পাওয়া, তা চোরাবাজারে বেচার ফন্দিফিকির করেছে। দুই সমাজশত্রুকে শনাক্ত করার পরই সাধুচরণ দারোগাবাবুর শরণাপন্ন হয়েছে। দারোগাবাবু তাকে বাগে পেয়ে গ্রেপ্তার করেছে। বিচারে তার ছ'মাস জেল হয়েছে। কেন সাধুচরণের এই সাধুতা, কেন সে ধরিয়ে দিল দুই সমাজশত্রুকে? আগে সে তালা সারাই করে সুখে সংসার চালাত। সেই সুখ-সংসার ভেঙেছে। ভাঙাচোরা-বিপর্যস্ত মানুষটি শেষে তালা ভাঙা রপ্ত করেছে। দুর্ভিক্ষে তার ছোটো

মেয়ে মারা গেছে। বউ মরেছে ম্যালেরিয়ায়, মরেছে জোয়ান ছেলে দুটো। পাগলের মতো কুইনিনের জন্য চারিদিকে ছুটে বেড়িয়েও জোগাড় করতে পারেনি। তাই সাধুচরণ ফুঁসে উঠেছে, 'হায় রে, এ দুটো বজ্জাতের কারসাজিতে আমার বউ, ব্যাটার মতো কত শত শত বউ, ব্যাটা না জানি মারা যাবে। তখন ভাবলাম, ফাঁসি যাই তাও আচ্ছা, এর বিহিত করা চাই।'

গল্পটির মধ্যে ট্র্যাজেডির হাহাকার আছে। সব হারানো সাধুচরণের নিদারুণ মর্মযন্ত্রণা আমাদের স্পর্শ করে। ছোটোদের শিক্ষা দেয়। শুভবোধ জাগায়। বন্ধুরা মানিকের ছোটোদের গল্পে বড়ো ভূমিকা নেয়। 'জব্দ করার প্রতিযোগিতা' গল্পে দুই বন্ধু একে অন্যকে জব্দ করতে গিয়ে চরম খেসারত দিয়েছে। 'ভয় দেখানোর গল্প'-এ রয়েছে প্রগাঢ় বন্ধুত্বের কথা। 'এলো' গল্পেও ফুটে উঠেছে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। এমনকি রূপকথাধর্মী গল্প 'দাড়ির গল্প'-এও রয়েছে দুই বন্ধুর উজ্জ্বল উপস্থিতি। দুটি প্রাণের অমল বন্ধুত্বে যাবতীয় বাধা-প্রতিবন্ধকতাও ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যায়। প্রীতিময় বন্ধুত্বের বন্ধন যত সুদৃঢ় হয়, জীবন ততই মাধুর্যময় হয়ে ওঠে। এসব গল্পের মধ্য দিয়ে বন্ধুত্বের অপার মহিমা ছোটোদের মনে গেঁথে যাবে। তারা প্রাণিত হবে। বড়ো হয়ে ওঠার পথটি তো নিষ্কণ্টক নয়, বাধা-বিপত্তিময়। সব বাধা পেরিয়ে কীভাবে এগিয়ে যেতে হয়, পৌঁছোতে হয় লক্ষ্যে, সেই লক্ষ্যপূরণের গল্পও তিনি লিখেছেন একাধিক। 'পাশ-ফেল' গল্পের নিখিল ছোটোদের সহজেই অনুপ্রাণিত করবে। অনুপ্রেরণা-জাগানিয়া গল্পের পাশাপাশি ভয়-ভাঙানিয়া গল্পও মানিক লিখেছেন। মানিকের অতিপ্রাকৃত গল্প যুক্তির আলোকে আলোকিত। ভূতের গল্প এদেশে ওদেশে কম লেখা হয়নি। অধিকাংশই তা যুক্তিহীন, অলৌকিকতা-সর্বস্ব। বিভূতিভূষণের মতো মহৎ লেখকও ছমছমে বীভৎস ভূতের গল্প লিখেছেন। ভৌতিক-আতঙ্কে ভরপুর এসব গল্প ছোটোদের পাতে আদৌ দেওয়া উচিত কি, সে প্রশ্ন তো রয়েই যায়। অতিপ্রাকৃত গল্পও কতখানি যুক্তির আলোকে আলোকিত হতে পারে, তার বড়ো দৃষ্টান্ত মানিকের 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পটি। 'অলৌকিক লৌকিকতা' গল্পটি তো মানবিকতায় উজ্জ্বল। হাস্যরসের গল্প ছোটোদের মহলে সহজে সমাদৃত হয়। কৌতুকরসের গল্প মানিক তেমন লেখেননি। 'সূর্যবাবুর ভিটামিন সমস্যা' গল্পটিকে অবশ্য এ পর্যায়ে রাখা যেতে পারে। 'শৈশব স্মৃতি যাচাই করার গল্প', 'পুরস্কার', 'আমার কান্না' ও 'বড়ো হওয়ার দায়'— এই চারটি রচনায় ফুটে উঠেছে মানিকের ছেলেবেলার স্মৃতি। মানিক যে স্মৃতি-আলেখ্য রচনা করেছেন, সেগুলিও ছোটোদের কাছে প্রেরণাদায়ী। মনের দৃঢ়তা বাড়ায়, সহনশীলতার শিক্ষা দেয়।

ছোটোদের সাহিত্যে চেনা ছক আছে, সে ছক-ফর্মুলার মধ্যেই অধিকাংশ লেখকই ঘোরাফেরা করেন, মানিক বরাবরই সেই গণ্ডির বাইরে থেকেছেন। মানবিকতায় ঋদ্ধ, সমাজমনস্কতায় উজ্জ্বল ছোটোদের এইসব গল্প বেড়ে ওঠার দিনগুলিতে বড়ো সহায়ক হয়ে উঠবে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছোটোদের সচেতন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠুক তারা। জগৎপারাবারের তীরে যে ছেলেরা খেলে চলেছে, তাদের যথাযথভাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সাহিত্য কত বড়ো ভূমিকা নিতে পারে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিশোর-সাহিত্য ফিরে পড়লে, তা সহজেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কপিরাইট উঠে যাওয়ার পর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা নিয়ে অনেক অনেক সংকলন বেরিয়েছে। ছোটোদের লেখা নিয়েও বেশ কয়েকটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। সবই প্রায় অযত্নে, অবহেলায় মুদ্রিত। দায়সারার ছাপ সেসব বইয়ের সর্বত্র। অনেক ক্ষেত্রে রচনার মূলপাঠও যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়নি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোদের লেখা বহু মেহনতে একদা সংগ্রহ করেছিলাম। এ কাজে লেখক-পুত্র শ্রীসুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহৃদয়-সাহায্যের কথাও মনে পড়ছে। বহু ঘাম ঝরেছে, লাইব্রেরির ধুলো মেখেছি, আড়ালে থাকা মানিক-রচনা উদ্ধারের আনন্দও উপভোগ করেছি। ধুলোমলিন জীর্ণ পত্রিকা-পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধার করা সেসব লেখা, এমনকি লেখা-সম্পর্কিত তথ্যও কপিরাইটহীন-আবহে অকাতরে এখন যত্রতত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। কপিরাইট উঠে যাওয়ার আগে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোদের লেখার

যে সংকলনটি আমার সম্পাদনায় বাংলা আকাদেমি থেকে প্রকাশিত হয়েছিল, সেই সংকলনভুক্ত সমস্ত লেখাই নবকলেবরে প্রকাশিত এই 'পুনশ্চ'-সংস্করণে রাখা হল। অতিরিক্ত কিছু রচনাও সংযোজিত হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছোটোদের জন্য চারটি উপন্যাস লিখতে শুরু করলেও শেষ করেছিলেন মোটে একটি। সেটি 'মাঝির ছেলে'। 'মাঝির ছেলে' মানিকের প্রথম সারিতে থাকা উপন্যাসের একটি। সে উপন্যাসটির পাশাপাশি 'মাটির কাছের কিশোর কবি' উপন্যাসটিও এই সংকলনের রাখা হল। মানিকের এই অসমাপ্ত উপন্যাসটি পরবর্তীকালে সমাপ্ত করেছিলেন 'ভোম্বল সর্দার'-স্রষ্টা ছোটোদের প্রিয় লেখক খগেন্দ্রনাথ মিত্র। আমরা খগেন্দ্রনাথ-কৃত উপন্যাসের শেষাংশটিও সংকলনভুক্ত করেছি। রাখা হয়েছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি অসমাপ্ত উপন্যাসও। 'মশাল' ও 'রাজীবের লম্বা ছুটি'। 'মশাল' পত্রিকা-পৃষ্ঠায় ছাপা শুরু হলেও 'রাজীবের লম্বা ছুটি' কোনো পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে লেখার পরিকল্পনা নিয়ে বোধহয় মানিক লিখতে শুরু করেননি। ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের কথা না ভেবে ভেতরের তাগিদে লিখতে শুরু করা এই উপন্যাসটি শেষ হলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিশোর সাহিত্যে এক স্মরণীয় সংযোজন হিসেবে চিহ্নিত হত। পারিবারিকসূত্রে প্রাপ্ত এই অসমাপ্ত উপন্যাসটির পাণ্ডুলিপি প্রথম অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল বাংলা আকাদেমি থেকে প্রকাশিত মানিক রচনাবলির দ্বাদশ খণ্ডে। ওই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত কিশোর-রচনার পর্বটি আমিই সম্পাদনা করেছিলাম। কৌতূহল-জাগানিয়া সেই 'রাজীবের লম্বা ছুটি' কিশোর-রচনা সংগ্রহের এই 'পুনশ্চ'-সংস্করণে রাখতে পেরে ভালো লাগছে।

আশা করি নবকলেবরে প্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিশোর-রচনার এই সম্ভার ছোটোদের কাছে সমাদৃত হবে। বড়োদেরও ভালো লাগবে। মানিক ছোটোদের সাহিত্যের ব্যতিক্রমী লেখক। অথচ সেভাবে আলোকিত হননি। বড়োদের সাহিত্যের বড়ো লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোদের লেখাতেও আলো পড়ুক। বইটি যত্নে প্রকাশ করলেন শ্রীসন্দীপ নায়ক। তাঁকে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জানাই।

জানুয়ারি ২০২৬

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

*প্রসূন বসু, রমেন সরকার, সনৎকুমার গুপ্ত, অশোককুমার রায়, আশিস হাজরা, নূর মহম্মদ, শম্ভুরঞ্জন ভট্টাচার্য, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণাকেন্দ্র, হিরণ লাইব্রেরি, দেবসাহিত্য কুটীর, বরানগর পিপলস লাইব্রেরি, বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরি, ব্যাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরি ও বেলুড় পাবলিক লাইব্রেরি।*

# সূচিপত্র


উপন্যাস

মাঝির ছেলে ১৯
মাটির কাছের কিশোর কবি ৮৩
মশাল ১২৫
রাজীবের লম্বা ছুটি ১৪২

গল্প

চণ্ডীচরণের গান ১৫৯
কোথায় গেল ? ১৬৪
জব্দ করার প্রতিযোগিতা ১৬৯
তিনটি সাহসী ভীরুর গল্প ১৭৫
তৈলচিত্রের ভূত ১৮১
পাশ-ফেল ১৮৭
ভয় দেখানোর গল্প ১৯০
সনাতনী ১৯৪
চোর সাধুচরণ ২০০
টিকিট নেই ২০২
অসহযোগী ২০৭
সিদ্ধপুরুষ ২১১
এলো ! ২১৬
পনেরোই আগস্টের কবিতা ২২১
পোড়া ছায়া ২২৩
দাড়ির গল্প ২২৭
দু'আনা আর দু'পয়সা ২২৯
ভীরু ? ২৩৩
গল্প চুরির গল্প ২৩৭

বিপদ আর বন্ধু ২৪১
সূর্যবাবুর ভিটামিন সমস্যা ২৪৫
ঠাকুমার গোসা ২৪৮
ম্যাজিক ২৫১
কাণ্ড কারখানা ২৫৪
অলৌকিক লৌকিকতা ২৫৭
বাজি ২৬০
হাওয়া বদলের ফলাফল ২৬৩

অনুবাদ গল্প

পিং পিং ২৬৫

ছেলেবেলার গল্প

শৈশব স্মৃতি যাচাই করার গল্প ২৭০
আমার কান্না ২৭৬
পুরস্কার ২৭৯
বড় হওয়ার দায় ২৮১

কবিতা

জীবন-মরণ ২৮৫
শারদীয়া ২৮৬

প্রবন্ধ

শিল্প সাহিত্য ‘সৃষ্টি’ কেন? ২৮৯
ছোটোদের বড়োদের ছোটোগল্প ২৯০

রচনা-পরিচিতি ২৯১